দ্বিতীয় প্রবাস - ৫

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন

আমেরিকা আসার পর থেকেই জেট ল্যাগের কারণে ঘুমের একটু সমস্যা হচ্ছে, কিন্তু সময়টা খুব খারাপ কাটছে না। দিনের বেলায় ইস্কুলের গ্রীষ্মের ছুটির কল্যাণে বাসায় অবস্থানরত নাতি, নাতনীর লোভনীয় সঙ্গ, এটা ওটা নিয়ে তাদের সাথে খুনসুটি, আর বিকেল এবং রাতে অফিস ফেরত মেয়ে আর জামাইয়ের সঙ্গে গাল গল্প করার আনন্দটাই অন্য রকম। বহুদিন পর গতানুগতিক যান্ত্রিক জীবনের ইঁদুর দৌঁড়ের থেকে বহুদুরে এখানে, এই লোভনীয় পরিবেশে প্রায় চার সপ্তাহ থাকবো ভাবতেই মনটা এক অপার্থিব আনন্দে ভরে উঠছিল; কেমন যেন চাঙ্গা বোধ করছিলাম। কিন্তু 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না!' বিধি বাম; হরিষে মহা বিষাদ ঘনিয়ে এলো। অগাস্টের চার তারিখ মিডল্যান্ড সময় দুপুর সাড়ে বারোটায় আমি আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মানুষ, আমার মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেলাম। সিডনী থেকে আমার ছোট বোন লিপি জানালো আমাদের সর্বংসহা জননী বেগম আকরামুন নেছা পনেরো মিনিট আগে বাংলাদেশ সময় রাত সোয়া দশটায় ঢাকায় আমার মেজ বোন চায়নার কোলে মাথা রেখে চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে গেছেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। আর কোনদিন টেলিফোনে তাঁর কণ্ঠ ভেসে আসবেনা 'সাবধানে থাকিস বাবা', তিনি জানতে চাইবেন না ' কবে ঢাকায় আসবি?'

মৃত্যুকালে আমার মায়ের বয়স হয়েছিল ৮৮ বৎসর। অনেক দিন ধরেই তিনি ব্লাডপ্রেসার, ডায়েবিটিস এবং অন্যান্য বার্ধক্য জনিত রোগে ভুগছিলেন। তবে তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে যাননি। মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত হাটাচলা করতেন এবং নিজের বেশীর ভাগ কাজ নিজেই করতেন। কিন্তু এপ্রিল মাসের প্রথম দিক থেকেই তাঁর শরীর হঠাৎ করে খারাপ হতে শুরু করলে তাঁকে ঢাকায় আমার মেজোবোনের বাসায় নিয়ে আসা হয়। মে মাসের শেষ দিকে তার অবস্থার অবনতি ঘটে; তাঁকে তখন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দশই জুন থেকে চব্বিশে জুন আমি মায়ের সাথে ঢাকায় ছিলাম। তখন তিনি স্মৃতিভ্রংশতায় ভুগছিলেন - আমাকে চিনতে পারলেও তিনি কথা বলতে চাচ্ছিলেন না। তিনি খেতে পারতেন না বলে তাকে টিউব দিয়ে খাওয়াতে হতো। নাকে টিউব নিয়ে কেমন যেন একটা শূন্য মন উদাস করা চাহনি নিয়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে আকাশ দেখছিলেন। ডাক্তারদের মতে মায়ের জন্য আর কিছু করার ছিলনা। ঢাকা থেকে চলে আসার সময় আমি নিশ্চিত জানতাম সহসাই একদিন মায়ের মৃত্যুর সংবাদ আসবে। কবিগুরু লিখেছিলেন 'জীবনেরে কে রাখিতে পারে, আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে, তার নিমন্ত্রন লোকে লোকে; নব নব পূর্বাচলে, আলোকে

আলোকে।' জানতাম মায়ের অনন্ত যাত্রার নিমন্ত্রন এসে গেছে। আর সে জন্য নিজেকে মানসিক ভাবে প্রস্তুত ও করেছিলাম। সত্যি বলতে কি প্রতি ওয়াক্ত নামাজে দাঁড়িয়ে আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছি তিনি যেন আমার মাকে তাঁর এই দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেন। কিন্তু সত্যি যখন মা মুক্তি পেলেন সেই মুক্তির সংবাদ কিন্তু আমার কাছে চরমতম দুঃসংবাদ হয়েই এলো। সেই সংবাদকে সহজভাবে গ্রহন করার যে প্রস্তুতি আমার ছিল বলে ভাবতাম, তার রেশমাত্র আর খুঁজে পেলাম না। জলে ঝাপসা হয়ে আসা চোখের সামনে আমি আমার মায়ের অন্তিম যাত্রা দেখতে পেলাম। সর্বংসহা যে মা আমার এই ষাটবছরের জীবনের চলার পথের প্রতিটি পদক্ষেপের সাথী ছিলেন, তার বড় সন্তান হয়ে ও আমি তাঁর শববাহী খাটে কাঁধ দিতে পারলাম না! আমার এ দুঃখ আমি কোথায় রাখি? আসলেই আমার মতো দূর্ভাগা আর হয়না। ১৯৭৬ সালের এপ্রিল মাসে যখন আমার বাবা মারা যান, আমি সে সময় সুদানে ছিলাম। যে বাবার হাত ধরে চলতে শিখেছিলাম, সে বাবার অন্তিম যাত্রায় তার শববাহী খাটেও আমি কাঁধ দিতে পারিনি।

আমার মা একজন কবি ছিলেন। তাঁর লিখা বেশ কিছু কবিতা 'বেগম' এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। তাঁর তিনটি কবিতার বই এবং একটি ছোট গল্পের বই ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা তাঁর জীবনের অনেকটা জুঁড়ে ছিল। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, মা আমাকে কবিতা শুনিয়ে ঘুম পাড়াতেন, কবিতা শুনিয়ে জাগাতেন। গ্রীষ্মের অলস মধ্যাহ্ন, বর্ষার বর্ষণমুখর সন্ধ্যা, জোৎস্না স্নাত শারদীয় রাত, হিমানী হৈমন্তী সকাল, শীতের করুণ ম্লান জোৎস্না কিংবা বাসন্তী গোধুলী - সব সময়েই আমার মা গুন গুন সুর করে বিভিন্ন স্বাদের কবিতা আওড়াতেন। আমি জানি আমার সে কবিতা পাগল মা আর জাগবেন না। এই দূর প্রবাস থেকে তাঁর অত্যন্ত পছন্দের একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তির মাধ্যমেই তাঁকে আমি আমার সশ্রদ্ধ বিদায় অভিনন্দন জানাই।

'শোকে দুঃখে লাঞ্ছনায় বন্ধুর জীবনে;
তোমার অমৃত দৃষ্টি স্নেহের সিঞ্চনে,
বিকশিত কর বারংবার-
হে জননী, তব শুভ্র কমল চরণে
লহো দীন সন্তানের দীন নমস্কার।'

পরম করুনাময় আল্লাহতায়ালার কাছে প্রার্থনা, তিনি আমার মায়ের আত্মার শান্তি দিন। আমীন।

মায়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরের কয়েকটি দিন খুব খারাপ কাটলো। সর্বক্ষন কেমন যেন একটা অপরাধ বোধ আমাকে তাড়া করে বেড়ালো। বারবার মনে হলো ছেলে হিসেবে মায়ের প্রতি আমার যে কর্তব্য ছিল আমি তা করিনি। এ কথা সত্যি যে অভাব অনটনে জর্জরিত বাকশালী আমলের দুঃস্বপ্নের বাংলাদেশ ছেড়ে চলে না আসলে আমি আমার সন্তান, বাবা, মা, ভাই, বোনের মোটামুটি বড় সংসার কোনভাবেই বাঁচাতে পারতাম না। কিন্তু তারপর তো দীর্ঘ ত্রিশ বছর কেঁটে গেছে। ভাই বোনেরা নিজেদের সংসারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আমার নিজের মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলে চাকুরী করছে, আর্থিক অনটন শেষ হয়েছে, তারপর ও তো আমি আমার নিঃসঙ্গ মায়ের কাছে ফিরে যাই নি। ১৯৮৮ সালে আমার একমাত্র ছোট ভাই মারা যাবার পর থেকে মা একা থেকেছেন। তখন আমি সিঙ্গাপুরে। মা বেড়াতে এসেছেন, কিন্তু পাঁচ ছয় সপ্তাহের বেশী থাকতে চাননি। আর থাকবেন ই বা

কেমন করে, বেঁচে থাকার জন্য মানুষের তো কথা বলার সঙ্গী সাথীর ও প্রয়োজন হয়। আমি কাজে চলে যাই। আর তাই মা কে সঙ্গ দেবার জন্য আমার স্ত্রী কাজ ছেড়ে দিয়ে মায়ের সাথে থাকেন। এটা আবার মায়ের পছন্দ নয়। তাই তিনি তাঁর নিজের পরিচিত নারায়ণগঞ্জের বাড়ীতে ফিরে যাবার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন। আমি নিজেও যে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবিনি তা নয়; কিন্তু এ ব্যপারে মা আমাকে সবসময় নিরুৎসাহিত করেন। আইন শৃংখলা বিহীন, নৈতিকতা বর্জিত, দূর্নীতিগ্রস্ত বাংলাদেশে আমি ফিরে আসি, সেটা মা কোনদিন ও চান নি। কিন্তু সত্যি কি তা মায়ের মনের কথা ছিল? আমি দেশে ফিরে গেলে তিনি কি আনন্দিত হতেন না?

শ্বাশ্বত ভালোবাসা ও স্নেহের ছায়ায় নিরাপদ নিদ্রা

আজকে মা যখন ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছেন, তখন দুর প্রবাসের অলস দুপুর আর ঘুমহীন রাতে এই এ সব এবং এ ধরণের আরো বহু উত্তর বিহীন প্রশ্নের জবাব খুঁজে বেড়াই।

চলবে - -

(ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলসের মার্কেটিং বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। এই রচনাটি আমেরিকাতে তার দ্বিতীয়বার অবস্থানের অভিজ্ঞতার বিবরণ।)